Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 17-23
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পাইকানের জনজীবন : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ড. ইন্দিরা ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, এস এস কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম

Abstract

Villages have been built up on the bank of rivers, canals and lakes and beels. In south-east part of Hailakandi, the road which connects Silchar, the first village alongside this road is known as Paikan. The history and the cultural surroundings and environment of this tiny village draw our notice and attention. It looks like that the Sabdakar community of this village is the true representative and emissary of folk culture of Bengal. This Sabdakar Community has kept the Chorok Puja of Bengal alive and active till today. Even though, the light of education is yet to take firm, dense and deep root in the village, the mothers of present generation are curious to confer even highly developed education to their offspring. Diverse superstitions largely control and dominate their lifestyle. Economic development is yet to make an impression there. This article which is basically a fieldwork has been portrayed and put on display against the background of rural community centric lifestyle.

ভূমিকা: বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি ১৯৮৯ ইং-তে কাছাড় জেলা থেকে ভিন্ন হয়ে জেলায় উন্নীত হয়েছিল। হাইলাকান্দি শহরের চারদিক ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন গ্রাম ও চা বাগান এলাকায়। শহর ও গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ধলেশ্বরী ও কাটাখাল নদী। প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্যের মায়াঘন এক চিত্ররূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে জেলাজুড়ে। হাইলাকান্দির ভাষা-সংস্কৃতি মূলত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আঞ্চলিক রূপ। বরাক উপত্যকার অন্য দুটি জেলা শিলচর ও করিমগঞ্জ থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট এই অঞ্চলটি। হাইলাকান্দি শহরের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি সড়ক পথ শিলচরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতিদিন এই অঞ্চলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে যান উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এবং পাঠদান করতে। আবার গুরুতর অসুস্থ রোগীকে শিলচর ম্যাডিকেল কলেজে পৌঁছে দিতে এই পথটিই ব্যবহৃত হয়। এই সড়ক পথ দিয়ে যেতে প্রথম যে গ্রামটিকে অতিক্রান্ত করতে হয় এর নাম পাইকান গ্রাম। আলোচ্য নিবন্ধে পাইকান গ্রামটিরই জনজীবনের একটি ছবি তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

ভৌগোলিক পরিসীমা: পাইকান গ্রামটির ভৌগোলিক পরিসীমা ২৩৭ দশমিক ৯৬ হেক্টর। ২০০৯ ইং পরিসংখ্যান মতে, পাইকানের আনুমানিক জনসংখ্যা ৩৬২৪। হাইলাকান্দি শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রামটি।

পাইকান গ্রামটি যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে 'বাঘারপুল' বলে একটি সেতু রয়েছে যার নীচে বয়ে চলেছে বাঘা খাল। এই খালটি হাইলাকান্দি জেলার চন্দ্রপুরে 'যুগীরখাল' নামে পরিচিত, এখান থেকেই খালটি প্রবাহিত হয়ে মধ্যপথে 'বাউয়ার বিল'-এ পড়েছে যে বিলের একপাশে বরবন্দ গ্রাম অন্যপাশে সিঙ্গারীর পার। এই বিলের জল নিষ্কাশিত হয়ে পাইকানের পশ্চিমাংশে 'বাঘাখাল' নাম নিয়ে পূর্বদিকে ব্রজপুর গ্রামের বড়ইরতলি গ্রামকে ছুঁয়ে পলা নদী হয়ে বরাক নদীর অববাহিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া পাইকান থেকে সড়কপথে

মার্টিজুরীর পথে যেতে আরেকটি খাল চোখে পড়ে যা 'ছনউরার খাল' নামে খ্যাত। ইতিহাস আছে যে, এই খালটির দুপারেই আখ ও ছন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত যার দরুণ এখানে প্রচুর গুড় উৎপাদিত হয়ে বাজারজাত হত। কিন্তু হাইলকান্দির পাঁচগ্রামে কাগজকলের প্রস্তুতি পর্বে অনেক সংখ্যক শ্রমিকের নিযুক্তিতে শ্রমিকের অভাবে গুড়ের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তা কৃষিক্ষেতে পরিণত হয়। দুটি খালের সেতুর মাঝপথে আছে পাইকানের বাজার যা টেমপুর বাজার নামে অভিহিত।

বাঘাখাল

ছনউরার সেতু

হাইলাকান্দি জেলার বাঁশডহর গ্রামের কৈয়াবিল থেকে নালার মতো জল নিষ্কাশিত হয়ে পাইকানের 'ছনউরার খালে'র পাশে 'চুরগোল' বিলের উৎপত্তি হয়েছিল। যে বিলের পূর্বদিকে আছে ব্রজপুর গ্রাম। ১৯৯৩ ইং বন্যায় বিলটিতে পলি পড়ে তার জলধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এতবছর পর ও শক্ত মাটি জমাট বাঁধেনি বলে বিলটি কৃষি কাজেরও অনুপযুক্ত। বর্তমানে বিলটি জার্মানী ফেনায় পরিপূর্ণ এবং মহিষ ইত্যাদি প্রাণী এই কর্দমাক্ত জলে বিচরণ করে।

চুরগোল বিল

জীবিকা: পাইকান গ্রামের লোকেরা আগে কৃষিকাজ করত, এখনো কৃষিকাজ অনেকেই করে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ, গাড়ীর ড্রাইভার, কেউ সুপারী বা সব্জীর ব্যবসাতে লিপ্ত। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের দাস, পাল, চন্দ পদবীধারী কয়েক পরিবার অনেকটাই স্বচ্ছল, স্বল্প সংখ্যক হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত লোকের মধ্যে কেউ শিক্ষক বা ব্যবসায়ী অথবা অন্য কোনো পেশার সঙ্গে সংযুক্ত। এই গ্রামে সবথেকে অধিকসংখ্যক শব্দকর গোষ্ঠীর বসবাস, যদিও মরমপুরের মোহনটিলায় শব্দকর কয়েক পরিবারের বসতি আছে তবে পাইকানেই তাদের আধিক্য ও বিস্তার প্রবল। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে শব্দকর বা বাদ্যকররাই দরিদ্রতম হিসেবে পরিগণিত। তাদের বংশগত পেশা বাদ্য বাজানো। কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই তারা বাজনা বাজাতে পটু। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজাবার বায়না নেয়। যদিও উৎসব বিয়ে সারাবছরের প্রতিদিন থাকে না ফলে পুরুষরা রিক্সা, ই-রিক্সা এবং অটো চালিয়েও উপার্জনের চেষ্টা করে। বাড়ির মজিলারা শহরে গিয়ে বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার বৃত্তি গ্রহণ করে। শহরাঞ্চলই তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎসস্থল।

শিক্ষাব্যবস্থা: পাইকান গ্রামে সরকারী দুটি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় এবং তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে গ্রামের কচি কাঁচারা অধ্যয়ন করে। এই গ্রামের বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা সমাজসেবী বিজয়ভূষণ দাস তাঁর পৈতৃক জমি দান করে অনেক স্কুল নির্মাণের সুয়োগ করে দিয়েছেন। যার মধ্যে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও আছে। পাইকান জমিও তিনিই দান করেছেন। এখানে ১১০ আসনের একটি কনফারেন্স হল আছে যেখানে গ্রামের জন্য হিতকর অনেক মূল্যবান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বর্তমানে এই অফিসে এনআরসি সংক্রান্ত কাজকর্ম হয়ে থাকে এবং কয়েকজন সমাজসেবীদের দ্বারা 'বয়স্ক শিক্ষা'-র (Adult Education) ক্লাস হয়ে থাকে। গ্রামের অভিমুখেই সেন্ট মেরীজ স্কুলটিতে শহরাঞ্চলের অনেক ছেলে-মেয়ে শিক্ষা লাভ করছে। এখন এই গ্রামের বেশীর ভাগ বাচ্চারাই সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে বিদ্যালাভে উৎসাহিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস

বালিকা বিদ্যালয়

ধর্মীয় সংহতি: পাইকান গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রাদায়েরই লোকজন বিদ্যমান। তাই এই গ্রামে মন্দির এবং মসজিদের সহাবস্থান পরিলক্ষিত। উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে করে থাকে। গ্রামে সব থেকে অধিক রয়েছে কালীমন্দির। এছাড়া এতদঞ্চলের লোকের মধ্যে মনসা মন্দির। আর লোকনাথ, শনি, শিব ইত্যাদি মন্দির নির্মাণের এবং পূজোর মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় উদ্ভাসিত।

সংস্কৃতি: ঐতিহ্য পরম্পরা ও উত্তরাধিকার অবলম্বনে ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে আজও যে ধারাটি বর্তমান তা বরাক উপত্যকার গ্রামগুলোতেও পরিলক্ষিত, হাইলাকান্দি অঞ্চলের পাইকান গ্রামটিও এর ব্যতিক্রম নয়, বরাকভূমির নগরায়নের ইতিহাস প্রাচীন নয় বলেই এখানকার সংস্কৃতিও গ্রামীণ। তবে এই শতকে বিশ্বায়নের প্রভাবে শহরাঞ্চলে নগরায়নের ছাপ সুস্পষ্ট। শহরবাসীর অন্তরে গ্রাম্য লোক ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত থাকলেও এখন এসবের ধারক ও বাহক সাধারণত গ্রামের লোকেরাই। গ্রামের মানুষের জীবন চর্যায় পিতৃ-পুরুষের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার এই প্রবণতা অনুশীলনের দ্বারাই বেঁচে থাকে। তারা প্রতিদিনের অভাব অনটন ও দুঃখ জর্জর জীবনের একমুখীনতা ও একঘেয়েমিতাকে কাটিয়ে উঠে মূলত লোকগান, কীর্তন, লোকনৃত্য ইত্যাদি পরিবেশনার মাধ্যমে। তাছাড়া উৎসব, পালা পার্বন গ্রামের মাটি ও মানুষকে প্রাণবন্ত ও সজীব করে রাখে যার সঙ্গে যুক্ত তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসও।

পাইকান গ্রামে বিশ শতকের তিনের দশকে যাত্রা, ঢপযাত্রার প্রচলন ছিল। গ্রামেরই বাসিন্দা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন দাস ওরফে চারুসাধু নামে পরিচিত এক ব্যক্তি এসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাত্রার বিষয় ছিল ঐতিহাসিক কোনো কাহিনি এবং ঢপযাত্রা অনেকটা কবিগানের মতো প্রশ্নোত্তর পর্ব গানের সুরে বিভিন্ন ভঙ্গিমা দিয়ে পরিবেশন করা। তিনি বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে যাত্রা পালা ও ঢপযাত্রা করতেন। প্রত্যেকবছর যাত্রাপালা করার জন্য গ্রামে তাদের জমি-জমা বিক্রি করতে হত তাই সাতের দশকে এই যাত্রাগান বন্ধ হয়ে যায়। চারুসাধুর পিতা বদলরাম দাস ও একজন সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন, তিনি গ্রামের লোকজনদের নিয়ে সঙ্গীত চর্চা করতেন।

পরবর্তীকালে কীর্তন গান গ্রামের হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করে। আজো কার্তিক মাসের প্রভাতে প্রতিদিন নারী পুরুষ মিলে নগর কীর্তনে বের হয়। মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিরস বঙ্গভূমির জনচেতনায় ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐশ্বরিক লীলা, সন্ন্যাস গ্রহণ ও সংসার ত্যাগ বাংলার ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেককে করুণ রসধারায় সিক্ত করত এবং এর জনপ্রিয়তা বরাক উপত্যকায় আজও বহমান।

পাইকানের মূল ভূখন্ডে হিন্দু জনবসতি একটু বেশী বলে হিন্দু সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠান লৌকিক ব্রত পালন এখনো দেখা যায়। টেমপুর বাজারের কালীমন্দিরে প্রতি সোমবার তিননাথের সেবা দেওয়া হয়। এই লৌকিক ব্রতের উপাস্য দেবতা তিননাথ অর্থাৎ শিব। তিনটি পানবাটা, তিনটি মমবাতি ও তিনটি প্রদীপ জ্বালিয়ে পুরোহিতের দ্বারা

ব্রতটি সম্পন্ন হয়। এই ব্রতের পুরোহিতের অংশগ্রহণ পরবর্তীকালের সংযোজন। তিননাথের উদ্দেশ্যে কীর্তন গান করা হয়। যেমন,-

ঐ আসরে আসবা হর ডুম্বরধারী।
এক পয়সা তিন কল্কী সিদ্ধি।।
আরেক পয়সার পবন সুপারী।

.....
অন্তিমকালে দয়াল তিননাথ।
দিও চরণতরী বা হর ডুম্বুরধারী।।

মধ্যযুগের নাথ সাহিত্যের মধ্যে শিববন্দনা বা শিবকে যোগী সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল তাতে অনেক লৌকিক উপদানের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে এই ব্রত আজও অনুমৃত।

লৌকিক ব্রত পালন পাইকান গ্রামের এক আদি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তাই এই গ্রামে কার্তিক সংক্রান্তির দিন হয় রাখালসেবা। 'রাখালসেবা' বা 'আই' কৃষিকেন্দ্রিক ধর্ম বিশ্বাস থেকে উপজাত। এই ব্রত রাখাল বালকেরা করে থাকে এবং তা মেয়েলি ব্রত নয়। গরুর স্বাস্থ্য এবং প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে সংক্রান্তির দিন ওরা কৃষ্ণপুজো করে। কার্তিক মাসে কিশোররা গ্রাম ও শহরের বাড়িতে বাড়িতে লৌকিক ছড়া বলে সিধে বা সিধা সংগ্রহ করে। খুবই প্রচলিত একটি ছড়া হল-

ডেফল নি রে ডেফল নি
এগু ডেফল দিবে নি

.....
নামার গাউয়ের পুয়াইনরে
আই হিকলায় কইরে
আছড়া ধানের তলে রে
আছড়া ধানের বড় বড় পাত্তা
বাঘে খাইল পুতের মাথা

অথবা,

শিকি লড়ে শিকি লড়ে
ঝনঝনাইয়া টাকা পরে।

এই ছড়াগুলো অসংলগ্ন এবং এতে কথ্য ভাষার প্রয়োগই বেশী।

পাইকানের মধ্যে বিশেষ করে শব্দকর সম্প্রদায়রা বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রবাহকে উজ্জীবিত রেখেছে বলা যায়। যেমন তারা আজো ধামাইল নৃত্য ও গীত পরিবেশন করে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে। এই ধামাইল নাচ বৃহত্তর সিলেট অর্থাৎ ব্রিটিশযুগের সুরমা উপত্যকা, বর্তমান বাংলাদেশ এবং আসামের বরাক অঞ্চলের প্রচলিত এক বিখ্যাত লোকনৃত্য। বিয়ের অনুষ্ঠানে নানা স্ত্রী আচারের সঙ্গে এই নৃত্য গীত মেয়েরা সমবেতভাবে করে থাকে। এই গান ও নৃত্যের অন্যতম বিষয় রাধা-কৃষ্ণ কথা। যেমন: জল ধামাইলের একটি গীত-

বাঁশী কে বাজায় কে বাজায়
ওই ঘাটেতে শোনা যায়
চল গো ললিতা জলে যাই।

বিয়ের অধিবাস সংক্রান্ত গীত-

শ্যামের গলে বন মালা গো।
কদমতলে কাজল বরণ কালা।।

শিশুর অন্নপ্রাশন বা 'মুখে ভাত' অনুষ্ঠানে গীত হয়-

স্নান করিয়া মায়ের সোনা
বাইরে কেনে রইলা গো।

এইসব গান তারা কথ্য ভাষায় বা উচ্চারণে গেয়ে থাকে। হাইলাকান্দি শহরের বুকে বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে অর্থের বিনিময়ে শব্দকর সম্প্রদায়ের নিরক্ষর মহিলারা এই নৃত্য গীত সহযোগে প্রদর্শন করে।

শব্দকর সম্প্রদায়ের পুরুষরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন 'চড়ক' পুজোও করে যা বৃহত্তর বঙ্গভূমির গাজন উৎসবের সঙ্গে একীভূত। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, চড়ক অর্থ সূর্যের চক্রপথে আবর্তন এবং তা সূর্যোৎসব নামে খ্যাত। সেদিন সূর্য দ্বাদশ রাশির পথে পরিক্রমা শেষ করে আবার পূর্বপথে নতুন যাত্রার জন্য আরেকটি রাশিতে প্রবেশ করে। পুরো চৈত্র মাস যারা চড়ক পুজোর সঙ্গে জড়িত তারা শিব-গৌরী ও কালী সেজে এবং রাম দা নিয়ে গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে। একটি মাস সংগৃহীত সিধে নিয়ে নিরামিষ ভক্ষণ করে এবং পরম নিষ্ঠায় দিন যাপন করে। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক (শাল) গাছের নীচে হর-গৌরীর (অর্ধনারীশ্বর) পুজো করে। কম বয়সী ছেলেরা মন্ত্রের দ্বারা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে, রাম দায়ের কলার উপর নৃত্য করে লোককে অবাক করে দেয়। এছাড়া সাধুরা তরুণদের পিঠের মধ্যে লোহার বঁড়শী বিঁধিয়ে ফুটো করে চড়ক গাছের অগ্রভাগে শূণ্যে ঘোরান। অনেকসময় পায়রার গলা ছিঁড়ে ওরা রক্ত পান করে। মন্ত্রের শক্তি দেখতে জ্যান্ত মানুষকে মৃতের ন্যায় করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। মন্ত্রের যে কত শক্তি বা জোর গ্রামীণ মানুষ বা শহরের বাবুরাও অনেকসময় তা দেখে ভিরমি খায়। চড়ক উৎসবের এই ঐতিহ্য পাইকান গ্রামের শব্দকরেরাই টিকিয়ে রেখেছে।

চড়ক

সমাজ-মানসিকতা: পাইকান গ্রামের অধিবাসীদের মানসিকতা এখনো গ্রাম্যই রয়েছে। কারণ তারা সমাজ নামক এক অদৃশ্য শক্তির কাছে আজ ও অবনত, আধুনিকতা উত্তর আধুনিকতা পর্ব অতিক্রম করেও ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতা সংস্কৃতি তাদের সমাজজীবনে প্রকাশমান। তারা আজো শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে আর্থিক অভাব অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী। অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের লোকবিশ্বাস আছে যে, তুক-তাক, ঝড়-ফুঁক,

বাণ-মারা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের মঙ্গল করা এবং অন্যের অনিষ্ট সাধন করা। পুরুষরা দিনের আলোয় রোজগার করলেও রাত্রি আঁধারে তীর খেলে মদ ও গাঁজা খেয়ে নেশা করে। ফলে সংসার এবং সন্তানের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিক তারা চিন্তা করে না। তবে তুলনামূলক একাংশ নারীদের মধ্যে এই সচেতনতা দেখা গেছে যে তারা বাচ্চাদের উন্নতমানের শিক্ষা সংস্কৃতি দিতে আগ্রহী। গ্রামের বস্তি এলাকায় কোনো পিতৃহীন শিশুর মা যখন সকালবেলা শহরে উপর্জনের উদ্দেশ্যে গমন করে তখন এই শিশুগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিবেশিনীরা হাসিমুখে করে থাকে। সমাজে এধরণের ঐক্যের বাতাবরণ সবাইকে সংঘবদ্ধ করে রেখেছে বলা যায়।

শব্দকর বস্তির শিশুরা

উপসংহার: পাইকান গ্রামটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালিত। গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা গ্রামের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও নানা স্থানীয় সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা অর্জন করেছে তবে আজ পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতিতে তেমন কোনো অভাবনীয় উন্নতি ঘটেনি। পাইকান গ্রামের মানুষ অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। গ্রামের চুরগোল বিলটিকে যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্বাবধানে খনন করে মৎস চাষ করা হয় তবে গরীব লোকের আর্থিক দুর্বলতা ঘুচবে আশা করা যেতে পারে। আর্থিক অনটন হ্রাস পেলে শিক্ষা সম্বন্ধে আরো তীব্রভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। গ্রামে গাঁথা এই বরাক উপত্যকার শিক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতির উৎকর্ষতা উন্নতমানের হলে তবেই না দেশের প্রগতি ত্বরান্বিত হবে। কারো অজানা নয় গ্রামগুলোই দেশের প্রকৃত সম্পদ। তাই এ ধরনের গ্রামগুলোর সামগ্রীক উন্নতিকল্পে নীতি নির্ধারকরা এবং আধুনিক সমাজ যদি ওদের পাশে থাকে বুকে বল অর্জন করে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অধিকারী হবে বরাক উপত্যকার অন্যান্য জেলার সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলাও এতে কোনো দ্বিমত নেই।

তথ্যসূত্র:

১। পাইলট ষ্টাডি।
২। প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক সাক্ষাৎকার।
৩। পরোক্ষ সাক্ষাৎকার।
৪। আন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বাংলার লোকসংস্কৃতি, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯২৭, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।
২। সংস্কৃতির রঙ-রূপ, কামালুদ্দীন আহমেদ, ১৯৯০, সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ ইউ. কে।